দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৪|৭|৭৯ ...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

121

২৪/৭/৭৯ দ

প্রাইমারী স্কুল-ঘর উন্নয়ন

আলোচনা

—এম, এ, বশীর

সেকালে যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো, ওসব এলাকার বিত্তবান লোকজন বিদ্যালয় গৃহের শিক্ষা উপকরণাদিসহ বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দিতেন। অবশ্য অন্যান্য কালের মত সে সময় বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণও আসবাবপত্র করে মোটেই ব্যয় সাপেক্ষ ছিলো না। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার পর ছাত্র সংখ্যানুপাতে একজন বা দুজন শিক্ষক নিয়োগ করা হতো এবং লোকাল বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাস মাস শিক্ষকদের বেতন দিতেন। সেই আমলে বাঁশের বেড়া ও চার চালাবিশিষ্ট টিনের ছাউনিযুক্ত বিদ্যালয় গৃহগুলো এমনি শক্ত করে নির্মাণ করা হতো যে ঝড়-তুফানের মধ্যেও ওগুলো টিকে থাকতো। আর যদি কোন একটি বিদ্যালয় দুর্যোগ কবলিত হয়ে পড়ে যেতো, অমনি এলাকার লোকজন কালক্ষেপ না করে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করে দিতেন এবং হরহামেশাই ওগুলোর প্রতি নজরদারি রাখতেন। সে সময় বিদ্যালয় গৃহের কোন মালপত্র চুরি হতো না। কিন্তু আজকাল প্রায়ই বিদ্যালয় গৃহের মালপত্র চুরি হয়। আর বিদ্যালয় গৃহ পড়ে গেলে কেউ ওগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয় না। ফলে, মাসের পর মাস বছরের পর বছর ওগুলো পড়ে থাকে। অনেকে বলে থাকে, সরকার আছে, ওগুলো একদিন না একদিন পাকা করে দেবে। পাকিস্তান লাভের পর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সরকার, প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নামে এক পরিকল্পনার অধীনে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থার অধীনে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় এলাকার লোকজনকে ১০ হাজার ও সরকারকে ১০ হাজার মোট ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৬১ সন থেকে ৬৩ সন পর্যন্ত এভাবে বিদ্যালয় গৃহের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে।

অতঃপর ১৯৬৮ থেকে ৭০ সন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে ২০ হাজার টাকার এক পরিকল্পনার অধীনে পাকা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বিভিন্ন থানায় স্বল্প সংখ্যক বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে নির্মিত হয়। সে সময় সিও ও চেয়ারম্যান ছিলেন এব্যাপারে সর্বেসর্বা। বিদ্যালয় কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব মোটেই ছিলো না। ফলে তাদের খেয়ালখুশী মাফিকই বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হতো। তখন দেখা যেতো যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হওয়ার পর কোন কোনটির দেয়াল ধসে গেছে। আবার কোন কোনটির ছাউনি সামান্য বাতাসে উড়ে গেছে ও দরজা জানালা ভেঙ্গে পড়ছে।

স্বাধীনতার পর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। এবং সরকার সাবেক যুগের জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলো সহ নতুন নতুন বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন। পুরাতন বিদ্যালয়ের ঘর দরজা মেরামত কাজের জন্য দশ পনের বিশ হাজার ও নতুনভাবে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। অর্থাৎ ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ভুক্ত করে বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়।

বর্তমানে ১ম ও ২য় পর্যায়ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে ওগুলোর কাজ শেষ হলেও সমাপ্তি সার্টিফিকেট নিয়ে গোল বেধেছে। সে যুগের সিও চেয়ারম্যানের দাপট গেলেও এখন এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষা সম্পর্কীয় উপ-প্রকৌশলীর দাপট বিরাজ করছে। জানা গেছে, ও দু ব্যক্তির সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কাজ সম্পূর্ণ হলেও সম্পূর্ণ ধরা হচ্ছে না। কাজেই তাদেরকে বড় অংকের টাকা দিয়ে খুশী করতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষককুলকে ঋণ ধার ও কোন কোন ক্ষেত্রে জায়গা জমি বিক্রি করে সংশ্লিষ্ট প্রভুদের আর্জি পূরণ করতে হচ্ছে। আবার কোন কোন শিক্ষক সমাপ্তি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে না পারায় বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আর কেউ কেউ এ ঘাটতি পূরণ করতে

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৩-এর কঃ পর)

গিয়ে কারচুপির আশ্রয় নিচ্ছেন। ফলে কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ছে। এভাবে বিদ্যালয় গৃহগুলো নির্মিত হওয়ার ফলে অর্থাৎ ২।৩ বছর যেতে না যেতেই সাবেক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে—আর সরকার এ ভাঙ্গা গড়ার কাজেই লেগে রয়েছেন।

আমাদের মতে দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে খেয়াল করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ঘরদোর নির্মাণ হেফাজত ও দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় এলাকার লোকজনের উপর ন্যস্ত করা উচিত। এমন কি ব্যক্তি বিশেষের নাম দিয়ে ওগুলো চালু করতে পারলে আরও ভালো হয়। বলাবাহুল্য, বহু যুগ ধরে দেশে হাজার হাজার মসজিদ, মক্তব মাদ্রাসা স্কুল ও কলেজ ব্যক্তি বিশেষের দানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনও সগৌরবে চলছে। জানা গেছে যে একমাত্র সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে আড়াই হাজার কওমী মাদ্রাসা আজও ব্যক্তিবিশেষের দানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এব্যাপারে স্থানীয় ইউপি পরিষদ সমূহের বিরাট ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি। দেশে এখনও ২/৩ অংশ বিদ্যালয় গৃহের কাজ বাকী রয়েছে। ওগুলোর কাজ কবে যে শেষ হবে তা আল্লাই মালুম। এব্যাপারে আরও একটি কথা বলা দরকার যে দেশের পৌর এলাকা ও ঢাকার পৌর কর্পোরেশনের অধীনে বিদ্যালয়গুলোর পুনরায় পরিচালনার ভার দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। ইতিপূর্বে ওসব বিদ্যালয় বেশ ভালভাবেই চলছিলো। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোকে সরকারী হিসেবে গণ্য করলেও পড়াশুনা পরিচালনার ক্ষেত্রে অবনতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মোট কথা, ঘরদোর নির্মাণ ও হেফাজতের দায়-দায়িত্ব বিত্তশালী ও ধনবান লোকদের উপর ন্যস্ত করতে পারলে যেমন ওগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে গিয়ে দেশের লোকজনের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে।